



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - v, Issue - iii, Published on July issue 2025, Page No. 305 - 309

Website: <https://tirj.org.in>, Mail ID: info@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

নিম্নবর্গীয় চেতনার আলোকে ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’ : একটি চলমান সমাজের ইতিবৃত্ত

ড. মথুর গুপ্ত

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

কবি নজরুল কলেজ, মুরারই, বীরভূম

Email ID : mathurg02@gmail.com

Received Date 25. 06. 2025

Selection Date 20. 07. 2025

Keyword

Sub-class
thought, textual
construction,
impact on
society.

Abstract

Debesh Roy's 'Teesta Parer Brittanta' is a widely read and widely discussed novel. He has made a new application in this novel by denying the conventional idea that we had about the novel. We all know the origin of the novel from the novel at the hands of the colonial powers. From the beginning of the novel, novels were being written in Bengali literature following this novel. When worthwhile Novel was discussed, it was judged by comparing it with the works of leading writers of foreign literature. The colonial powers have taught us to think like their discourse, we have been happily carrying that thought for a long time. Leaving aside our own literature, turning away from that tradition, I was spending my days writing and reading novels with resources from novels given by the Lord. After Debesh Roy's novel came before us, that idea was shattered. He brought new ideas to Bengali literature about novels. He has also managed to impress those who read his novels.

Discussion

দেবেশ রায়ের ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’ বহুল পঠিত বহুল চর্চিত একটি উপন্যাস। উপন্যাস সম্পর্কে আমাদের মনে যে প্রচলিত ধারণা ছিল তাকে অস্বীকার করে তিনি একটি নতুন ধরনের প্রয়োগ এই উপন্যাসে ঘটিয়েছেন। ঔপনিবেশিক শক্তির হাত ধরে নভেল থেকে উপন্যাসের উদ্ভবের কথা আমরা সবাই জানি। উপন্যাসের সূচনাকাল থেকে এই নভেলকে অনুসরণ করেই বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস রচনা হয়ে আসছিল। সার্থক উপন্যাসের আলোচনা করতে গেলেই বিদেশী সাহিত্যের দিকপাল লেখকদের রচনার সঙ্গে তুলনা টেনে তার বিচার করা হত। ঔপনিবেশিক শক্তি তাদের বয়ানের মতো করে আমাদের ভাবতে শিখিয়েছে, আমরাও মহানন্দে সেই ভাবনাকেই বহুকাল ধরে বহন করে চলেছি। আমাদের নিজস্ব যে সাহিত্য তাকে দূরে সরিয়ে, সেই ঐতিহ্য থেকে মুখ ফিরিয়ে, প্রভুর দেওয়া নভেল থেকে রসদ নিয়ে উপন্যাস রচনা এবং পাঠ করে মহা আনন্দে দিন যাপন করে যাচ্ছিলাম। দেবেশ রায়ের উপন্যাস আমাদের সামনে আসার পর সেই ধারণা ভেঙে

চুরে গেছে। তিনি উপন্যাস নিয়ে নতুন ভাবনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন বাংলা সাহিত্যে। যারা তাঁর উপন্যাস পাঠ করবেন তাদেরও তিনি ভাবিত করে তুলতে সমর্থ হয়েছেন।

যুগ যুগ ধরে আমাদের মনে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে উপন্যাস হল গল্পের একটি বড় প্রকার। সেখানে একটি জমাটি গল্প আদি-মধ্য-অন্ত সম্বলিত হয়ে বয়ে চলেবে। পাঠক আনন্দ পেলেই উপন্যাস সার্থক বলে বিবেচিত হবে। বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এসে আমরা দেখতে পেলাম, একটি বিরুদ্ধ মত। একটি নতুন ধরনের কথা আমরা শুনতে পেলাম, তা হল - উপন্যাসের নির্মানটাই আসল, পরিনতির দিকে বিশেষ দৃষ্টি না দিয়ে নির্মান কৌশল নিয়ে বেশি ভাবিত এই সময়। এই নতুনত্বের স্বাদ আমরা দেবেশ রায়ের প্রায় প্রত্যেকটি উপন্যাসেই পাই, বিশেষ করে তাঁর বৃত্তান্ত মূলক উপন্যাসগুলিতে এর প্রভাব বেশ প্রকট বলেই মনে হয়। ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’ উপন্যাসটিও এই আধুনিক ধারার উল্লেখযোগ্য একটি বয়ান।

সময়ের চাহিদা মেনে লেখকগণ শুধুমাত্র কাহিনি প্লট বা পরিণতি নিয়ে ভাবিত নন। বর্তমান জটিল সময়ের ছবি, এবং তার সঙ্গে মানুষের ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটানো অনেক বেশি প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দিয়েছে এই সময়ের লেখকদের কাছে। ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’ উপন্যাসে দেবেশ রায় তৎকালীন সময়, সমাজ এবং সেই প্রেক্ষাপটে ব্যক্তি মানুষের অন্বেষণ করে চলেছেন বাঘারুকে সঙ্গে নিয়ে।

উপন্যাসের লেখকের উদ্দেশ্যে দেবেশ রায়ের একটি মতামত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, -

“সমকালকে ধরতে না পারলে উপন্যাস বাঁচেনা, আবার সমকালকে ধরেও উপন্যাস বাঁচে না। সময়ের কাছে দায়বদ্ধ বলেই ঔপন্যাসিক লেখেন। কবি হয়ত অন্তরের নিকট প্রতিশ্রুতি বদ্ধ। ... উপন্যাসের অস্থিষ্ট সমাজ নয়, সময় নয়, ইতিহাসও নয় উপন্যাসের অস্থিষ্ট ব্যক্তিমানুষ। এই সমাজ, সময় আর ইতিহাস ব্যক্তি মানুষের চরিত্র ও মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক জটিল করে দেয়। ফলে মানুষের সংজ্ঞা বারবারই নতুন করে খুঁজতে হয়। তাই মানুষকে খুঁজতে গিয়ে এই সমাজ, সময় আর ইতিহাসকেও খুঁজতে হয়। সমাজ, সময় আর ইতিহাসধৃত ব্যক্তি মানুষ হচ্ছে উপন্যাসের অস্থিষ্ট। একদিকে ব্যক্তি মানুষ আর একদিকে সময়, এই দুইয়ের ভিতর সঙ্গতি আবিষ্কার করাই ঔপন্যাসিকের শিল্পগত সবচেয়ে জরুরী প্রশ্ন। সময় নিরপেক্ষ প্রেম-ঘৃণা-হতাসা-আশা যেমন ঔপন্যাসিকের অস্থিষ্ট নয়, ব্যক্তি নিরপেক্ষ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সত্যাসত্যও তেমনি ঔপন্যাসিকের অস্থিষ্ট নয়।”

দেবেশ রায় তাঁর ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’ উপন্যাসে সমাজ, সময়, ইতিহাসের আবহে ব্যক্তি মানুষ নির্মাণে মনোনিবেশ করেছেন। পরিবেশ, পটভূমির ব্যক্তি এবং ইতিহাসের সরণী বেয়ে দেবেশ রায় আদি অন্তের পরোয়া না করেই আখ্যান বুনে চলেছেন। কখন উপন্যাসের সূচনা হচ্ছে, কোন সময়ে যবনিকা পড়ছে তাঁর কোন নির্দিষ্ট সময়ের উল্লেখ উপন্যাস পাঠক জানতে বা বুঝতে পারেন না। তাঁর কোন দরকার আছে বলেও মনে হয় না। ‘চলাই জীবন স্থবিরতাই মৃত্যু’ এই আশু বাক্য মেনে নিয়েই তিনি উপন্যাস লিখতে বসেছেন। সমগ্র উপন্যাসটি ছয়টি পর্বে বিভক্ত করে প্রকাশ করেছেন, যথা - আদি, বন, চর, বৃক্ষ, মিছিল, অন্ত। পর্ব শব্দটি যুক্ত করে তিনি মহাকাব্যিক ভাবনা পাঠকের মনে আগের থেকেই দিতে চেয়েছেন কি না আমরা নির্দিষ্ট করে বলতে পারি না। তবে প্রায় সাড়ে আটশো পাতার উপন্যাসে মহাকাব্যিক আকার যে তিনি দিতে চেয়েছেন সে কথা আমরা বলতেই পারি।

সমগ্র উপন্যাস জুড়ে বাঘারু নামের এক নাম-গোত্রহীন চরিত্রের চলন আখ্যানের মূল বিষয় বস্তু হয়ে উঠেছে। তবে বাঘারুকে উপন্যাসের নায়ক ভাবলে ভুল হবে। অস্তিত্বহীন একটা মানুষ যে প্রাতিষ্ঠানিক কোন পরিচয়ের পিছনে না ছুটে জীবনের টানেই ছুটে চলেছে। পিতা-মাতার দেওয়া নেই, নিজস্ব কোন ঠিকানা নেই। কখনও সে বাঘারু আবার কখনও মইশাল এইরকম আরো কত নাম তার গ্রহন বর্জন ঘটেছে। সব রকম মানবিক মর্যাদা বঞ্চিত বাঘারু যেন তিস্তা নদীর মতোই নিজের নিয়মে বয়ে চলেছে। স্বাধীন ভারতবর্ষে দেবেশ রায় যেন অপর এক ভারতবর্ষের সন্ধান পাঠককে দিতে চেয়েছেন। সমাজে বাঘারুদের মতো মানুষদের উপন্যাসের মূলবিষয় বানিয়ে বয়ান রচনা করার সাহস দেবেশ রায়ের মতো

করে অন্যকোনো লেখক কতটা সার্থকতার সাথে করতে পেরেছেন সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। সমালোচকের ভাষায় বলতে পারি, -

“বাংলা সাহিত্যে ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’-এর মতো উপন্যাস আগে কখনও লেখা হয়নি। ... আট নয় বছর ধরে নানা পর্ব জুড়ে জুড়ে লেখা এপিক উপন্যাসটি এদেশের কয়েক কোটি দরিদ্রতম মানুষকে নিয়ে লেখা, যে মানুষ বনের পশুর নিয়মে বাঁচে, দরিদ্রসীমা দিয়ে যাকে ধরা যায় না। এই স্বাধীন সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষে তার বেঁচে থাকা এক প্রতিস্পর্ধী বেঁচে থাকা। সেই বেঁচে থাকা নিছক দিনের পর দিন বেঁচে থাকা নয়, প্রতিদিনই একটা পুরো জীবন বাঁচা, একটা গোটা মানবজীবন বাঁচা, কিন্তু এ নিয়ে গৌরব করার কিছু নেই, দারিদ্রের মধ্যে তো কোনও গৌরব নেই, বড় বেশি অপমান আছে।”^২

এ প্রসঙ্গে প্রফুল্ল রায়ের ‘আকাশের নীচে মানুষ’ উপন্যাসের ধর্মাও দরিদ্র। সেও বসবাস করে দরিদ্রসীমার নীচে। কিন্তু বাঘারুর সঙ্গে তার মূলে তফাত আছে কারণ ধর্মার সমাজ, পরিবার আছে, প্রেম আছে, আশা আছে কিন্তু কোন প্রত্যাখ্যান বা প্রতিবাদ নেই। ঋণের বোঝা কাঁধে নিয়ে সে খেটে চলে নিজের একটা সংসার করার আশায়। উপন্যাসের একেবারে শেষে সে একটি বাক্য খরচ করেছে ‘তু হামনিকো আদমি নেহি’। লেখক যেন একপ্রকার জোর করে ধর্মাকে দিয়ে তারই অবদমিত প্রতিবাদের প্রকাশ ঘটিয়ে এক অপর ভাষ্য তৈরি করতে চেয়েছেন। দেবশ রায় ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’ উপন্যাসে বাঘারুরকে দিয়ে নিঃশব্দে সমগ্র রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাষ্য তৈরি করতে সমর্থ হয়েছেন। যে তিস্তা ব্যারেজ তিস্তা পারের মানুষের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নতির প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, বাঘারু তার নিঃশব্দ প্রতিবাদে সবকিছুকে প্রত্যাখ্যান করে তিস্তার পাড় ছাড়িয়ে হাটতে থাকে। এর শেষ কোথায় আমরা কেউ জানি না।

তিস্তাপারের বৃত্তান্তে দীর্ঘ বর্ণনার মাধ্যমে লেখক বাঘারুর আখ্যান রচনা করে চলেছেন। তবে লেখক পাঠকগণদের জানাতে ভোলেন নি তার অক্ষমতার কথা। এ গল্প বলতে চাওয়া তাঁর পক্ষে কতটা যত্নসহকারী।

“লেখক হিসাবে তাঁর অবস্থান তিস্তাপারের বৃত্তান্ত লেখার আগেও যেমন ছিল, এ বৃত্তান্ত শেষ করেও যে তিনি একই জায়গায় থেকে গেলেন, এমন চৈতন্যের যত্ননা দেবশ রায়কে ছেড়ে যায় না কখনও।”^৩

বাঘারু চরিত্র সৃষ্টি এবং লেখকের অক্ষমতার মূল্যায়নের চেষ্টা করেছেন সমালোচক। আদিপর্বের চোদ্দ পরিচ্ছেদে এসে লেখক ফরেস্টারচন্দ্রের মুখে ভাষা দিয়েছেন বাঘারুর পরিচয় প্রদানের নিমিত্ত, তবে সেই স্বর স্পষ্ট নয় আত্মগত। কাল্পনিক জমি জরিপ কর্তার ছবির সামনে দাঁড়িয়ে তাকে দিয়ে বলিয়েছেন, -

“হুজুর আসি গেইছি। মুই ফরেস্টারচন্দ্র। ফরেস্টারচন্দ্র বাঘারুবর্মন দেখি নেন। মোর মুখখান, দেহখান দেহি নেন। ... শুন হে হুজুর, কাথা মোর দুই খানা। কী দুইখান কাথা? একখান কাথা হইল যে তোমরা ত জমির হাকিম। মোর জমিঠে মোর নাম খান তুমি কাতি দাও। মোর হাল-বলদ-বিছন সগায় ওর। মুই হালুয়া আছিল কয়েক বছর। অ্যালায় আর নাই। বলদ যার, বিছন যার, হালুয়া যার, ধান যার জমি ত তারই হবা নাগে হুজুর। ত ওই জমিখান মুই ফরেস্টারচন্দ্র বাঘারুবর্মন ছাড়ি দিছ। লিখি দাও, শ্রীফরেস্টারচন্দ্র বাঘারুবর্মনক এই জমিতে উচ্ছেদ দেওয়া গে-এ-এ-ই-ল।”^৪

লেখক বাঘারুর আত্মকথনের মাধ্যমে তার নিঃশব্দ প্রতিবাদকে ভাষা দিয়ে সমগ্র রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতি ব্যঙ্গের আঘাত হেনেছেন। এরকম একটা মানুষের নামের আগে শ্রী যোগ করে সমাজের শ্রীহীন নগ্ন ব্যবস্থাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন। কিন্তু বাস্তবে এই ঘটনার সাক্ষী থাকে একরাশ কালো অন্ধকার।

‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’ উপন্যাসের মূল বিষয় বাঘারু বাকি সমস্ত ঘটনার সঙ্গে নিয়তির ফেরে ওতোপ্রতো ভাবে জড়িয়ে যায়। সে যে খুব ইচ্ছে করে, কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে এইসব ঘটনার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে নিয়েছে তেমনটা নয়। কতগুলি ঘটনার কথা আমরা স্মরণ করতে পারি যেমন, অপারেশন বর্গা, বন্যার সময়, উত্তরখণ্ডীদের আয়োজনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে, কামতাপুরের দাবীর মিছিলে, অন্তিমে তিস্তার ব্যারেজ উদ্বোধনে। এই ঘটনাগুলির কোনোটিতেই বাঘারু তেমন

প্রয়োজনীয় ব্যক্তি নয়। জীবনের মতো ইচ্ছের বাইরেও সমস্ত ঘটনার সঙ্গে তার নাম জড়িয়ে গেছে। রাষ্ট্রযন্ত্র এই মানুষগুলিকে সারা জীবন অহেতুক ব্যবহার করে গেছে, তাদের কাজের মূল্যায়নে কেউ ভাবিত নয়।

উল্লিখিত বয়ানের লেখক মূলত দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর মানুষের চলার কথাই প্রাধান্য সহকারে ব্যক্ত করতে চেয়েছেন। এই মানুষগুলির জীবন যন্ত্রনা আধিপত্যবাদী শক্তি সবসময়ই প্রত্যাখান করেছে বা অদৃষ্ট বলে দূরে ঠেলে দিয়েছে। উপনিবেশের মোহ আমাদের মননে এমন ভাবে বাসা বেঁধেছে যে স্বাধীনতার এত বছর পর আমরা এই ধরনের একটি প্রতিবেদন পাঠ করার সুযোগ পেলাম।

“পিছিয়ে পড়া সমাজে উপনিবেশবাদ সবচেয়ে শক্ত শেকলটা পড়িয়ে দেয়, কারণ মন যখন স্বৈচ্ছাবন্দিত্ব মেনে নেয়, আধিপত্যবাদ নিরীক্শুভাবে তার জগন্নাথের রথকে চালিয়ে যেতে পারে সর্বস্তরে। উপনিবেশীকৃত মন কখনও আধিপত্যবাদী মহাসন্দর্ভকে প্রশ্ন করতে পারে না, বিকল্প কোনো প্রতিবেদন খোঁজার তো কথাই ওঠে না। জ্ঞান ও প্রতাপের ইতিহাস রাজনীতি টিকে থাকে পরাভূত বর্গের এই বিকল্পহীনতার ওপর। ভাষা-চেতনা-সংস্কৃতি এককথায় জীবনযাপনে দখলদারি কায়ম করে তাদের ঠেলে দেয় অন্তর্বাসীর অবহেলিত অবস্থানে। লোকায়ত সংস্কৃতির উপলব্ধি ঐ সন্ধর্ভে কিছুমাত্র স্বীকৃতি পায় না, এবং উপনিবেশীকৃত মনও নিজের শেকড়কে নিজেই তাচ্ছিল্য করতে শেখে।”^৫

দীর্ঘ সময়ের উপনিবেশিক শাষন সহ্য করে আমাদের মননে সেই ভাবনার বীজ এত পোক্ত ভাবে গেঁথে গেছে, যাদের হাথে সম্ভবনা থাকে এই আধিপত্যকে ভেঙে নতুন বয়ান রচনা করার তারাও আধিপত্যবাদী শক্তির কাছে মাথা নত করে। চলতি হাওয়ায় গাঁ ভাসিয়ে দেয়। দেবেশ রায় তিস্তাপারের বৃত্তান্ত রচনা করতে গিয়ে সেই আধিপত্যকে তিনি ভাঙতে চেয়েছেন। রচনার ভাষা, প্রকাশভঙ্গি, চরিত্র নির্মাণ করতে গিয়ে তিনি শ্রোতের বিপরীতে হাঁটা লাগিয়েছেন। বাঘারু, মাদারিদের মতো মানুষ গুলির কথা দেশীয় চালে, আমাদের নিজস্ব প্রাচীন বয়ান রীতির অবলম্বনে নতুন এক ভাষা নির্মাণে সমর্থ হয়েছেন একথা আমরা বলতেই পারি। তিনি নির্মাণ করতে চেয়েছেন এক নতুন সময়কে যেখানে বাঘারু একটি প্রতীক মাত্র। এদের মতো অসংখ্য মানুষ রাষ্ট্রযন্ত্রের নির্দিষ্ট করে দেওয়া সমস্ত সীমারেখা মিথ্যা করে দিয়ে, তাদের গণনার বাইরে রেখে শুধুই জীবন ধারণ করে চলেছে। জীবন যাপন করার সময় তাদের কাছে নেই।

“উপনিবেশোত্তর সমাজেও সৃষ্টি ও মনন যেসব বুদ্ধিজীবির নিয়ন্ত্রনে থাকে, তাদের চিন্তাবৃত্তি উপনিবেশীকৃত হলে অটুট থেকে যায় আধিপত্যপ্রবণ প্রতিবেদন গড়ে তোলার অভ্যাস। চতুর ও সচেতন পরিকল্পনার মধ্যদিয়ে এবং বহু বিভাজিত সমাজের অন্তর্ভুক্ত দুর্বলতার সুযোগে যে কেন্দ্রীকৃত মহাসন্দর্ভ অজস্র গুল্মমূল ছড়িয়ে দিয়েছিল তাকে পরাভূত না করা পর্যন্ত উপনিবেশোত্তর সমাজে কোনো যথার্থ নতুন সংস্কৃতি, সাহিত্য কিংবা জীবনবোধের সূত্রপাত হতে পারে না। গড়ে উঠতে পারে না কোনো নতুন প্রতিবেদন।”^৬

দেবেশ রায় তাঁর সন্দর্ভে এই উপনিবেশোত্তর মননের সার্থক পরিচয় দিয়েছেন তাঁর বৃত্তান্ত গুলি রচনার মাধ্যমে। সমাজের দুর্বলতার সুযোগ না নিয়ে, সমাজকে নিজের দুর্বলতার কথা জানিয়েছেন। দুর্বল মানুষগুলিকে আধিপত্যবাদী সংস্কৃতির ধারক বাহকদের সামনে তুলে ধরে তাদের মনে একাধিক প্রশ্নের সম্মুখীন করে দিয়েছেন।

তিস্তাপারের বৃত্তান্ত উপন্যাসে দেবেশ রায় দুটি বর্গের ন্যারেটিভ নির্মাণ করেছেন। একটিকে আমরা সাহিত্যিক পরিভাষায় বলতে পারি এলিট এবং অন্যটি সাব-অলটার্ন। এই দুই বর্গের নিজস্ব ক্রিয়াকলাপ-এর বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন কীভাবে ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকা শ্রেণী, অপর শ্রেণিকে দারিদ্রের চরম সীমায় পৌঁছে দিয়েও শোষণের ক্রিয়া অক্ষুণ্ণ রাখে। তিস্তা নদীর পাড়ে ব্যারেজ নির্মাণ, সরকার কর্তৃক খাস জমি অধিগ্রহণ এবং এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বড়ো জমির মালিক, আর্থিক সঙ্গতিপূর্ণ মানুষজন, এছাড়াও বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ নিজেদের মধ্যে সমঝোতা করে নিয়েছেন। তার ফলে সমাজ শোষণের মাত্রার কোনো পরিবর্তন হয় নি। বাঘারু, মাদারি বা মাদারির মায়েরা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই

থেকে যায়। দেবেশ রায় তাঁর বয়ানের মাধ্যমে কোনো চরিত্র সৃষ্টি করেন নি, কোনো গল্প বলতে বসেন নি, তাঁর জীবন অভিজ্ঞতা একটি অবয়বের মাধ্যমে পাঠকের সামনে হাজির করেছেন। যার কোনো শেষ নেই। বাঘারুদের মতো অসংখ্য মানুষ যারা সমাজের একটি নেংটিতে আবদ্ধ, তারা চলতেই থাকে। এক তিস্তার পাড় ছেড়ে দিয়ে আবার অন্য কোনো চলমান জীবনের অংশ হয়ে জীবন ধারণ করে। সমালোচক অরুণ সেনের একটি মন্তব্য এখানে খুবই প্রাসঙ্গিক, -

“দেবেশের উপন্যাসেও সেই চলমানতার রূপই ক্রমশ শিল্পের মাহাত্ম্য অর্জন করেছে। যেখানে জমি বাড়তে থাকে, চেনা-অচেনা অসংখ্য চরিত্র যাওয়া-আসা করে, দেশ ও কালনির্ভর প্রসঙ্গের অভ্যন্তরে - আসে নতুন নতুন রহস্য, প্রতিনিয়ত বিচ্ছিন্নতা ও সংলগ্নতা ঘটতে থাকে পস্পরের মধ্যে-এই নিয়েই তাঁর মহাকাব্য, এই নিয়েই তাঁর বৃত্তান্ত।”^৭

Reference:

১. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, ‘বাংলা উপন্যাসের রূপ ও রীতির পালাবদল’, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ২২৬
২. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, ‘বাংলা উপন্যাসের রূপ ও রীতির পালাবদল’, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ২৩৫
৩. সেন, রুশ্মী, ‘সমকালের গল্প-উপন্যাসে প্রত্যাখানের ভাষা’, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৯, ১৯৯৭, পৃ. ২৬
৪. রায়, দেবেশ, ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃ. ৩৮-৩৯
৫. ভট্টাচার্য, তপোধীর, ‘প্রতীচের সাহিত্যতত্ত্ব’, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, ফেব্রুয়ারি-২০০৬, পৃ. ১২৬
৬. ভট্টাচার্য, তপোধীর, ‘প্রতীচের সাহিত্যতত্ত্ব’, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, ফেব্রুয়ারি-২০০৬, পৃ. ১২৬
৭. সেন, অরুণ, ‘দেবেশ রায়ের বৃত্তান্ত’ দেবেশ রায় সম্মাননা সংখ্যা, স্বপন পাণ্ডা ও উৎপল সাহা সম্পাদিত, ইম্প্রেশন, কলকাতা-১৪২১, পৃ. ১৮৪

Bibliography:

- শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা’, মডার্ন বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০০৪-২০০৫
- বেলা দাস ও বিশ্বতোষ চৌধুরী, ‘বাংলা আখ্যান বহুমাত্রিক পাঠ’, রত্নাবলী ২০১১
- প্রফুল্ল রায়, ‘আকাশের নীচে মানুষ’, দে’জ পাবলিশিং ১৯৮১
- কুন্ডল চট্টোপাধ্যায়, ‘সাহিত্যের রূপরীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ’, রত্নাবলী ২০১২
- দেবেশ রায়, ‘উপন্যাস নিয়ে’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা ১৯৯১
- তপোধীর ভট্টাচার্য, ‘সময় সমাজ সাহিত্য’, এবং মুশায়েরা, কলকাতা ২০১০